ইতিহাসের পাতায় ফিরে দেখা

এডিংটন-চন্দ্রশেখরের মধ্যকার 'বিখ্যাত' বিবাদ

অভিজিৎ রায়

ঝগড়া ফ্যাসাদ বাধানো মনে হয় মানুষের মজ্জাগত। ঝগড়া ফ্যাসাদ নেই কার জীবনে? পৃথিবীর সবচেয়ে শান্ত মানুষটিকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কখনও জীবনে ঝগড়া করেছেন কিনা - এর উত্তর 'হ্যা' হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কেউ কেউ আবার নিজে ঝগড়ায় অংশ না নিলেও এমন এক পরিস্থিতি তৈরী করে রাখেন যেন আশে পাশে ঝগড়া ফ্যাসাদ লেগেই থাকে। এই যে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কাম প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশে বর্তমানে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছেন যে দেশে একধনের 'ফ্যাসাদময়' অবস্থা বিরাজ করছে। অবশ্য রাষ্ট্রপতি না থাকলেও যে পরিস্থিতি যে খুব উন্নত ছিল তা নয়। আমাদের দু নেত্রীর ঝগড়া তো কম বলা - 'চুলোচুলি' প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ তো গেল নেতা নেতৃদের কথা। আমাদের নিজেদের মধ্যে কি ঝগড়া-ফ্যাসাদ নেই? আছে তো বটেই। ইন্টারনেট ফোরামগুলোতে আমরা এর আগে একটা ড. জাফর উল্লাহ আর সেতারা হাশেমের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখেছি, এখন দেখছি রায়হান - বিপ্লবের তেলেসমাতি। এ ওকে সাম্প্রদায়িক বলছে, তো ও একে বলছে 'ব্রেন ডেড'। এই চলছে কয়েক সপ্তাহ ধরে। কোথায় যেন পড়েছিলাম, এক শিক্ষক তার ছাত্রদের বলেছেন, 'টাকা-পয়সা জমি জামা নিয়া ঝগড়া করবা না, ঝগড়া করবা তত্ত্ব নিয়া, মতাদর্শ নিয়া। মনে রাখবা, লাইলী-মজনুর প্রেম থিকা মানুষ কিছু শিখে নাই, শিখছে বড় বড় মাইনস্যের ঝগড়া থিকা।' রায়হান-বিপ্লব যেন এই শিক্ষক সাহেবের উক্তিকে সত্যি প্রমাণ করবেন বলে পণ করেছেন!

আমাদের মত চুনোপুটিদের কথা না হয় বাদ দেই। বিখ্যাতজনেরাও কি দিনের পর দিন ঝগড়া করেছেন? কোন প্রথিতযশাঃ বিজ্ঞানী? তা তো বটেই। হাতের সামনেই উদাহরণ আছে। কোন ঝগরুটে বিজ্ঞানীর নাম করতে হলে প্রথমে নিউটনের কথাই সামনে চলে আসবে। নিউটনের প্রতিভা নিয়ে বোধ হয় কারোরই সন্দেহ নেই, তার প্রতিভা এমনই ছিল যে, এডমন্ড হ্যালি নিউটন সম্বন্ধে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'No mortal approach nearer to the gods'। কিন্তু প্রতিভাবান হলে কি হবে নিউটন মনমানসিকতায় ছিলেন, জেদী, একরোখা, আর কখনও বা প্রতিহিংসাপরায়ন। তার জীবনের একটা বড় অংশই তিনি অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাথে লড়াই-ফ্যাসাদ করে কাটিয়েছেন। 'ক্যালকুলাসের আবিস্কারক কে?' এ লড়াইয়ে নিউটন তার সমসাময়িক গনিতবীদ লিবনীৎসকে ষড়যন্ত্র করে প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিতই শুধু করেননি, জনসমক্ষে 'প্রবঞ্চক' হিসবে প্রতিপন্ন করেন। রবার্ট হুকের সাথে ঝগড়া লাগিয়ে তাকে তাচ্ছিল্য করে নিউটন বলেছিলেন - 'If I have been able to see further, it was only because I stood on the shoulder of the giants'। এগুলো ইতিহাস!

তবে আজকে আমার প্রবন্ধের বিষয় কিন্তু নিউটন নন। আজকে আমরা জোতির্বিজ্ঞানের জগতের এক স্মরণীয় বিবাদ নিয়ে আলোচনা করব। চন্দ্রশেখর সীমার যৌক্তিকতা নিয়ে এডিংটন-চন্দ্রশেখর বিবাদ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি খুবই আকর্ষণীয় ঘটনা। বিবাদটি নিঃসন্দেহে অসম নানা দিক থেকে : প্রথমত বয়স ও পদমর্যাদা, দ্বিতীয়ত বৈদগ্ধতা ও জ্ঞান। আর্থার স্ট্যানলি এডিংটন (১৮৮২-১৯৪৪) সেকালের খ্যাতনামা জ্যোর্তিপদার্থবিদ, এবং কেম্ব্রিজে প্লুমিয়ান প্রফেসর । আর তরুণ চন্দ্রশেখর কেম্ব্রিজের পি-এইচ. ডি

করতে আসা ভারতের এক অখ্যাত আনকোরা ছাত্র। বিলেতে আসার আগে থেকেই চন্দ্রশেখর এডিংটনের নাম জানতেন। আসলে ভারতের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন সময়েই পুরস্কার হিসেবে পাওয়া এডিংটনের লেখা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিখ্যাত বইটি জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার দিকে তাঁকে আগ্রহী করে তুলেছিল। ১৯৩০ সালে চন্দ্র কেম্ব্রিজে এসে জ্যোতিপদার্থবিদ্যায় গবেষণা শুরু করেন। গবেষণা করেত করতেই ১৯৩৪-৩৫ সালের দিকে তিনি শ্বেত বামনের আভ্যন্তরীণ গড়ণ নিয়ে গবেষণায় উৎসাহী হয়ে উঠেন।

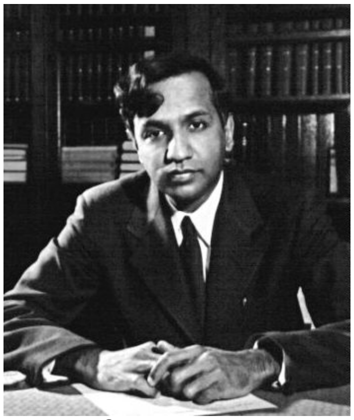

সুব্রামনিয়াম চন্দ্রশেখর (১৯১০-৯৪) এবং আর্থার এডিংটন (১৮৮২-১৯৪৪)

শ্বেত বামন হচ্ছে বিশেষ ধরনের নক্ষত্রের অন্তিম দশা। একটি নক্ষত্র যখন তার জীবনকালের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছায়, তখন এর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা হঠাৎ বাড়তে থাকে অবিশ্বাস্য গতিতে। এই তাপমাত্রার প্রভাবে অব্যবহৃত হাইড্রোজেন পরিবর্তিত হয়ে হিলিয়ামে পরিণত হয়। অভ্যন্তরের তাপমাত্রা যখন প্রায় ১০ কোটি ডিগ্রী কেলভিনে পৌঁছায়, তখন নতুন এক ধরনের ফিউশন প্রক্রিয়া চালু হয়ে তা হিলিয়াম পরমানুর নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে কার্বনে পরিনত করে। এই পুরো প্রক্রিয়াকে বলে 'ট্রিপল-আলফা' বিক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি তারা আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে পরিনত হয় লোহিত দৈত্যে (Red Giant)। আমাদের সূর্যও প্রায় পাঁচশ কোটি বছর পরে এমনি একটি লোহিত দৈত্যে পরিনত হবে। যখন এরকম একটি তারার সমস্ত জ্বালানী নিঃশেষিত হয়ে আসে, নিজস্ব ভরের কারণে সৃষ্ট মাধ্যাকর্ষনের প্রভাবে সেটি তখন প্রবলভাবে সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। অবশেষে এর আকার ছোট হয়ে আমাদের পৃথিবীর সমান আকারের তারায় পরিণত হয়, কিন্তু এর ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রতি ঘন মিটারের প্রায় একশ কোটি কিলোগ্রাম অর্থাৎ $১০^{৯}$ kg/m^3 বা $১০^{৬}$ gm/cc। তারার এই পরিনতিকে বলে শ্বেতবামন (White Dwarf)। যেখানে আমাদের পরিচিত পদার্থগুলোর মধ্যে প্লাটিনামের ঘনত্ব হল প্রতি সি.সিতে ২১.৪ গ্রাম, পারদের ঘনত্ব হল প্রতি সি.সি তে ১৩.৬ গ্রাম, আর হাইড্রোজেনের ঘনত্ব হল প্রতি সি.সি তে মাত্র ০.০৯ গ্রাম, সেখানে শ্বেত বামনের ঘনত্ব প্রতি সি সি তে প্রায় দশ লক্ষ গ্রাম! একটা উপমা দিলে বোধ হয় বোঝা যাবে এর ভার আসলে কতখানি। ছোট এককাপ পরিমাণ শ্বেত বামন জড় পদার্থের ভর পঁচিশটি গোদা সাইজের হাতীর চাইতেও বেশী হবে। এ ধরণের বিশাল ভরবিশিষ্ট রূপান্তরিত নক্ষত্রকে বলা হয় শ্বেত বামন (white dwarf) ।

সাধারণ তারার সাথে শ্বেত বামনের পার্থক্যটা হল সাধারণ তারার ভর বাড়ার সাথে সাথে এটি আয়তনেও বাড়তে থাকে, কিন্তু শ্বেত বামনদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উলটা। ভর বাড়ার সাথে সাথে এটি না বেড়ে বরং আরও সংকুচিত হতে থাকে। নীচের ছবিটা দেখলে হয়ত পাঠকদের কাছে ব্যাপারটা পরিস্কার হবে। লক্ষ্যনীয় যে, ভর বাড়তে বাড়তে এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যখন তারার ব্যাসার্ধ (আয়তন) কমে আক্ষরিক অর্থেই শুন্য হয়ে যায়।

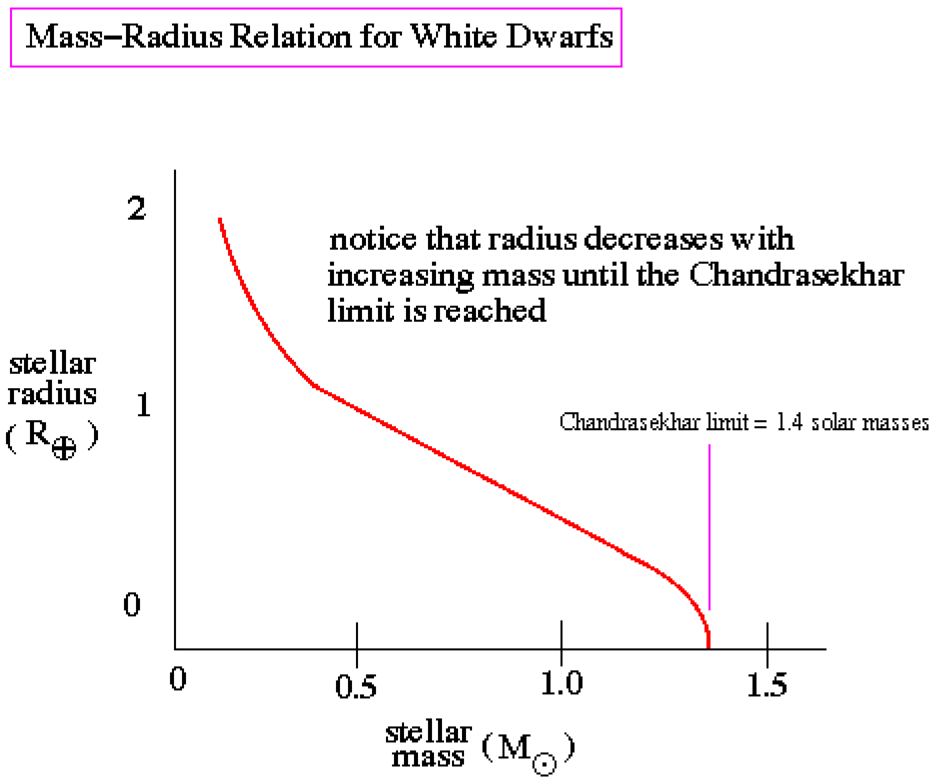

শ্বেতবামন নক্ষত্রের জন্য ভর-ব্যাসার্ধের সম্পর্ক

আসলে ১৯৩০ সালের আগে অধিকাংশ বিজ্ঞানীদেরই ধারণা ছিল, সব নক্ষত্রই বোধ হয় একই ভাবে শেষ পর্যন্ত জ্বালানী নিঃশেষ করে শ্বেত বামনে রূপ নেয়। কিন্তু চন্দ্রশেখর বললেন - না, সব তারা নয়। যে সমস্ত তারার ভর সূর্যের ১.৪ গুনের (এটাই বিখ্যাত চন্দ্রশেখরের সীমা) বেশী, তারা কিন্তু কখনই ওইরকমভাবে শ্বেত বামনে পরিনত হবে না। চন্দ্রের গবেষণালব্ধ এ সিদ্ধান্তই এডিংটনকে রীতিমত ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এডিংটনের তখন ধারণা হয়েছিল চন্দ্র আজে বাজে বকছেন। রয়েল অ্যাস্ট্রনমিকাল সোসাইটির একটা সম্মেলনে এডিংটন তো চন্দ্রকে রীতিমত হাস্যাস্পদ করে তুললেন। সবার সামনে চন্দ্রশেখরের গবেষণাকে অভিহিত করলেন 'নাক্ষত্রিক ভাঁড়ামি' (Stellar buffoonery) হিসবে। অবস্থা এমনই শোচনীয় হয়ে দাড়ালো যে, চন্দ্র এক সময় সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে আমেরিকায় পাড়ি জমালেন।   কারণ তিনি বুঝে ছিলেন এডিংটনের

দেশে আর যাই হোক কোন ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী পাওয়ার আশা তাঁর নেই। সে সময় এডিংটনের প্রভাবে আপ্লুত বিজ্ঞানীদের অনেকেই চন্দ্রের কথা না মেনে নিলেও পরে কিন্তু সবাই বুঝতে পেরেছিলেন যে এডিংটন নয়, ওই সময় চন্দ্রই আসলে সঠিক ছিলেন। আজ শত শত শ্বেত বামনের অস্তিত্বের কথা আমরা জেনেছি, এর সব গুলোই কিন্তু চন্দ্রের দেখানো নিয়মই অনুসরণ করে - আজ পর্যন্ত একটিও ব্যতিক্রম পাওয়া যায়নি।

ব্যাপারটার গভীরে আরেটু যাওয়া যাক। নক্ষত্রের জন্ম মৃত্যুর রহস্য অনেক আগে থেকেই বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদের আলোড়িত করেছিল পুরোমাত্রায়। সেসময় বিলেতের নামকরা জ্যোতির্বিদ ফাওলার (Ralph Fowler) ১৯২৬ সালে সর্বপ্রথম জ্যোতিষ্কের মত বিশালাকায় সিসটেমে প্রয়োগ করেন কেয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্রাবলী । ফাওলার ধরে নিয়েছিলেন যে শ্বেত বামনের অভ্যন্তরটি আসলে ইলেকট্রন সমুদ্রে ভাসমান প্রোটন, হিলিয়াম ও কার্বন নিউক্লিয়াসের সমাহার। আর এও ভাবলেন, উচ্চ তাপমাত্রা ও উচ্চ চাপে থাকবার ফলে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো নিশ্চয়ই রয়েছে অপজাত স্তরে (degenerate state)। সুতরাং ফাওলার ভাবলেন, একটি শ্বেত বামনকে আমরা অনেকটা ধাতুর অভ্যন্তরে মুক্ত ইলেকট্রন সমষ্টির মত এক ধরনের ব্যবস্থা হিসেবে ধরে নিতে পারি, তবে শ্বেতবামনের সাথে ধাতব ব্যবস্থাটির পার্থক্য হল ধাতব ইলেকট্রন ব্যবস্থাটি চাপের অধীনে না থাকায় ঘনীভুত থাকে না । ধাতব পরিবাহীর ক্ষেত্রে মুক্ত ইলেকট্রন ব্যবস্থা ফার্মি-ডিরাক বণ্টণ বব্যবস্থা মেনে চলে তা ফাওলার জানতেন; ফাওলার একই নীতি শ্বেতবামনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখালেন যে, পাউলি বর্জন নীতির কারণে অপজাত ইলেকট্রন গ্যাসটি প্রবল বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি করবে যা সম্ভাব্য ধ্বংসকে (gravitational collapse) প্রতিহত করে নক্ষত্রটিকে একধরণের স্থিতিশীলতা প্রদান করবে।

কেম্ব্রিজে থাকা কালে চন্দ্রশেখর সম্পুর্ণ সমস্যাটিকে নতুনভাবে দেখতে চাইলেন। তিনি শ্বেত বামনের অন্তরীণ অবস্থাটি চার ভাগে চিহ্নিত করলেন:

১. অ-আপেক্ষিক তত্ত্বীয় সাধারণ ইলেকট্রন ব্যবস্থা (non relativistic non-degenerate electron system)

২. আপেক্ষিক তত্ত্বীয় সাধারণ ইলেকট্রন ব্যবস্থা (relativistic non-degenerate electron system)

৩. অ-আপেক্ষিক তত্ত্বীয় অপজাত ইলেকট্রন ব্যবস্থা (non relativistic degenerate electron system)

৪. আপেক্ষিক তত্ত্বীয় অপজাত ইলেকট্রন ব্যবস্থা (relativistic degenerate electron system)

ফাওলার সর্বপ্রথম শ্বেত বামনে উপরের তিন নম্বর, অর্থাৎ অ-আপেক্ষিক তত্ত্বীয় অপজাত ইলেকট্রন ব্যবস্থা অবস্থা বিরাজ করছে ধরে নিয়ে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রয়োগ করলেন। অন্যদিকে চন্দ্রশেখর ভাবলেন যে, যেহেতু শ্বেত বামনের অভ্যন্তরটি খুব উচ্চ তাপমাত্রায় আছে, তাই সেক্ষেত্রে ফার্মি ভরবেগের (momentum) মান যথেষ্ট বড় হবে, ফলে আপেক্ষিক তত্ত্বকে অবশ্যই হিসেবে আনতে হবে। অর্থাৎ চন্দ্রশেখরের নতুন অনুকল্প ছিল শ্বেত বামনে তৃতীয় নয় বরং চতুর্থ অবস্থা, আপেক্ষিক তত্ত্বীয় অপজাত ইলেকট্রন ব্যবস্থা, বিরাজ করছে। তিনি প্রথম এ ধরণের ফার্মি গ্যাস ব্যবস্থার জন্য যুৎসই আপেক্ষিক তত্ত্বীয় অবস্থার সমীকরণ দাঁড় করালেন। তিনি অতি যত্নের সাথে দীর্ঘ সময় নিয়ে পরম ধৈর্যের সাথে গণনা সমাপ্ত করে অসাধারণ এবং চাঞ্চল্যকর সমাধানে উপনীত হলেন- এ ফলাফল এ্তই চাঞ্চল্যকর যে এডিংটন সহ তৎকালীন বাঘা বাঘা জ্যোতির্বিদরা তা মানতে চাইলেন না। চন্দ্রশেখরের গবেষণার মুল প্রতিপাদ্য হল যে সব নক্ষত্রে অপজাত ইলেকট্রন ব্যবস্থা রয়েছে তাদের মধ্যে যাদের ভর সুর্যভরের তুলনায় ১.৪ গুণের চাইতে বেশী তারা শ্বেত বামনে পরিণত হবে না। আগেই বলা হয়েছে এই গণ্ডিরই নাম **‘চন্দ্র শেখর সীমা’** (Chandrasekhar limit)। যে সব তারকা এই গণ্ডির মধ্যে পরে তাদের সবাইকে শ্বেত বামনের ভাগ্য বরণ করতে হবে। কিন্তু এর চাইতে বড় তারকাদের ভাগ্যে কি ঘটবে চন্দ্রশেখর কিন্তু তখন সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেন নি, আর তাঁর বিরূদ্ধে শাণিত আক্রমণ এসেছিল ও দিক থেকেই! চন্দ্রশেখর যখন কেম্ব্রিজে একাজ নিয়ে শেষ পর্যায়ে, একদিন তিনি অধ্যাপক এডিংটনের সাথে কাজের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করলেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎ চন্দ্রশেখরের জন্য এক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা, এডিংটনের কাছ থেকে কোন অনুপ্রেরণা তো পেলেনই না, বরং হলেন তীক্ষ্ম সমালোচিত। আলোচনার মধ্যেই এডিংটনের কাছে মুল সমস্যা যা ছিল সে কথা তুললেন- ‘What will happen to stars larger than 1.4M?’। চন্দ্রের কাছে কোন সদুত্তর ছিল না। তিনি এডিংটনকে তাঁর গণনা পদ্ধতি ও ফলাফল নিয়ে প্রত্যায়িত করতে সচেষ্ট হলে, এডিংটন এ ফলাফল মেনে নিতে পারলেন না:

> ‘ও হ্যা! তোমার গণনা ঠিক হতে পারে, কিন্তু তোমার পদার্থবিজ্ঞানের প্রয়োগ ঠিক নেই।’

১৯৩৫ সালে ১১ই জানুয়ারিতে লন্ডনে রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সমতির সদস্যদের সামনে চন্দ্র শেখর যে গবেষণা পত্রটি উপস্থাপন করেছিলেন তার পরপরই এডিংটনও ‘Relativistic Degeneracy’ শিরনামে একটি নিবন্ধ উত্থাপন করেন। কনফারেন্সের কর্মসুচী থেকে চন্দ্রশেখর ব্যাপারটি জানলেও এডিংটন নিজ থেকে তার প্রবন্ধের ব্যাপারে চন্দ্রকে কিছু বলেন নি যদিও লন্ডনে আসার আগের দিন এডিংটন তাঁকে জানিয়েছিলেন:

> তুমি তো বোধ হয় কাল লন্ডন যাচ্ছ। তোমার পেপার দেখলাম বেশ বড়। তাই আমি স্মার্টকে (সমিতির সেক্রেটারী) বলেছি তোমাকে বরাদ্দ ১৫ মিনিটের বদলে যেন আধা ঘন্টা সময় দেওয়া হয়।

চন্দ্রশেখর ঘটনাটি এভাবে মনে রেখেছেন:

> ‘‘ আমি বললাম, ‘আপনার বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ, স্যার’। কিন্তু তখনও তিনি (এডিংটন) যে কনফারেন্সে তার পেপার পড়বেন এ সম্পর্কে আমাকে বিন্দুমাত্র

> ধারণা দিলেন না। কাজেই ঘটনা সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা না থাকায় আমি একটু বলতে গেলে একটু বিচলিতই ছিলাম।”

নির্ধারিত তারিখের কনফারেন্সে চন্দ্রশেখর চমৎকারভাবে তাঁর বক্তব্য উত্থাপন করেছিলেন তাঁর প্রাপ্ত ফল ব্যখ্যা সহ এবং তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করলেন এই বলে: *'এ প্রবন্ধে আমি পরিস্কারভাবেই দেখালাম যে, সূর্যের চেয়ে ১.৪ গুণ বড় তারারা কখনই শ্বেত বামনে রূপ নেবে না, কিন্তু তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে তা জানার জন্য এ মুহূর্তে অনেক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত থাকল।'*

এডিংটন তাঁর বক্তব্যে বললেন:

> 'আমার এই গবেষণাপত্রের নির্যাস হল এটি দেখিয়ে দেওয়া যে 'আপেক্ষিক তত্ত্বীয় অপজাত ব্যবস্থা' বলে আসলে কিছু নেই। !! ... ড. চন্দ্রশেখর আগে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে এরকম (উদ্ভট) ফলাফল পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পরে এই গবেষণাপত্র থেকে তা মুছে দেন, আর আমি যখন তার সাথে এ নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আমি এই সিদ্ধান্তে পোঁছে গিয়েছিলাম যে, এটা 'আপেক্ষিক তত্ত্বীয় অপজাত ব্যবস্থা'র ই 'reductio ad absurdum' ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক দুর্ঘটনাই নক্ষত্রকে বাঁচিয়ে দিতে পারে, কিন্তু আমি আরো বড় ধরনের নিশ্চয়তা চাই। আমি মনে করি এমন এক ধরনের প্রাকৃতিক নিয়ম নিশ্চয়ই আছে যা যা তারাদেরকে এই ধরনের উদ্ভট আচরণ করার হাত থেকে বাঁচাবে।'

এডিংটন নানা ধরনের যুক্তির অবতারণা করে প্রমাণ করতে চাইলেন যে নক্ষত্রের ক্ষেত্রে এমন কি অতি উচ্চ দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন ব্যবস্থায় অনেক ইলেকট্রন একই কোয়ান্টাম স্তরে থাকতে পারে; এক্ষেত্রে পলির বর্জন নীতি অচল। এটিই ছিল এডিংটনের নীতির (Edington's principle) মোদ্দা কথা। আলোচনা এখানেই শেষ হলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু জ্যোতির্পদার্থবিদের মহাপুরোহিত সেদিন সমিতির বিজ্ঞ সদস্যদের সম্মুখে তরূণ ভারতীয় ছাত্রকে মমতাহীনভাবে ছিন্নভিন্ন করেন, এবং চন্দ্রের সকল গবেষণাকে 'ভাঁড়ামি' হিসেবে চিহ্নত করেন। বিদ্ধস্ত চন্দ্রশেখর সেদিনই কেম্ব্রিজে ফিরে আসেন - সে দিনের কথা তিনি মনে রেখেছেন এভাবে:

> 'আমি সভায় গিয়েছিলাম এই ভেবে যে সেখানে আমি নতুন কিছু শিখব, কিন্তু তার বদলে এডিংটন আমাকে 'ভাঁড়' বানিয়ে ছাড়লেন। আমি বিধ্বস্ত হয়ে গেলাম। আমি জানি না আমি আমার এই পেশাকে আর চালিয়ে নিতে পারব কিনা।
>
> আমি কেম্ব্রিজে রাত একটার সময় ফিরে আসলাম। আমার মনে আছে, আমি তখন হাটতে হাটতে কমনরুমে গেলাম। ফায়ারপ্লেসে তখনও আগুন জ্বলছিল। আর আমার মনে পড়ে যে আমি আগুনের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলছিলাম - 'এভাবেই পৃথিবী ধ্বংস হয় - কোন বিস্ফোরণে নয়, বরং নিরব কান্নায় ।'

সবচাইতে দুঃখজনক হল সমিতির শ্রোতাদের মধ্যে কেউ সাহস করে চন্দ্রের ফলাফলের পক্ষে কথা বলেন নি, এমন কি সহানুভুতিও জানান নি। বরং মিলনারের মত প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ খুশি হয়েছিলেন, এডিংটনের হাতে

চন্দ্রশেখর বিদ্ধস্ত হওয়াতে, কারণ চন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন যে মিলনারের অনেক ধারণাই ভুল। মিলনারের এ ধরনের প্রতিক্রিয়ায় ব্যথিত চন্দ্রশেখর কেবল বলেছিলেন, 'আমার এতে বডড রাগ হয়েছিল।'

এই অযাচিত বিবাদ চন্দ্রকে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করলেও একেবারে ভেঙে পড়েন নি, কেম্ব্রিজের সহকর্মীরা, যাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নামকরা পদার্থবিদ, তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং বলেছেন তাঁর পদার্থবিদ্যার ধারণায় কোন ত্রুটি নেই, ফাওলার সহ অনেকেই তাঁকে সহানুভূতি জানিয়েছেন, যদিও তা ব্যক্তিগত স্তরে। কারণ এডিংটনের সাথে তাঁরা প্রকাশ্যে বিবাদে জড়িত হতে চান নি। চন্দ্র নিজে যে ভুল করেন নি একথা সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি সে সময়ের পদার্থবিদ্যার আর এক জ্যোতিষ্ক নীলস্ বোরের মতামত জানতে বোরের ঘনিষ্ট সহযোগী রোজেনফেল্ডকে সবিস্তারে লিখলেন,

> '... আমার কাজ সম্পুর্ণ হয়েছে। এডিংটন নেকড়ের মত তর্জন-গর্জন শুরু করেছেন, অবশ্য এতে মিলনার খুশি হয়েছেন। ...মনে হয় দীর্ঘদিন এই টানা-পোড়ন এবং বিভ্রান্তি চলতে থাকেবে, তাই বোরের মত ব্যক্তি যদি প্রামাণিকভাবে এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন তাহলে পরবর্তী অগ্রগতির জন্য মহামুল্যবান হতে পারে।'

রোজেনফেল্ড তাঁকে দুটি চিঠি দেন, শেষেরটিতে লিখলেন, ''বোর ও আমি দুজনেই এডিংটনের বক্তব্যের মাথামুণ্ডু কোন অর্থই একেবারেই বুঝতে পারছিনা...। 'এডিংটনের নীতির' যদি কোন অর্থ কিছু আসলেই থেকে থাকে তা হবে পলির নীতি থেকে স্বতন্ত্র।" রোজেনফেল্ড চন্দ্রকে অনুরোধ করলেন এডিংটন তাঁর নীতি বলতে ঠিক কি বুঝাতে চান এ সম্স্লর্কে এডিংটনের কাছ থেকে পরিস্কার বক্তব্য সম্ভব হলে পাঠাতে, আর তা যেন হয়, 'মানবিক বোধগম্যতার সীমার মধ্যে'। এডিংটনের নীতির কৃৎকৌশলগত দিক নিয়ে নামকরা আপেক্ষিক তত্ত্ববিদ ম্যাকক্রিয়া (McCrea) বলেছেন:

> বিশেষতঃ কোন কিছুর আপেক্ষিকতার রূপ পেতে হলে আমাদের প্রয়োজন সেই বিষয়ের একটি মৌলিক সমীকরণ যা লোরেঞ্জিয়ান বিবর্তভেদ মান (Lorentzian invariant) দ্বারা সিদ্ধ হবে, অর্থাৎ তা সকল জাড্য কাঠামোর (inertial frames) জন্য একই হবে ... এডিংটন বলেছেন, এই বিশেষ ক্ষেত্রে লোরেঞ্জ বিবর্তভেদের কোন প্রয়োজন নেই।

এখনকার প্রেক্ষাপটে বিচার করলে এটি (এডিংটনের বক্তব্য) হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু সে কালটি সেরকম ছিল না। আপেক্ষিকতত্ত্ব নতুন, এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আরও নতুন- বিজ্ঞানীদের অনেকেই এর মর্মকথা বুঝতে চাননি বা পারেননি, কাজেই কেউ হাসেন নি এডিংটনের এ ধরণের উক্তিতে। এডিংটন তাঁর নীতির উপর একটি লেখা তৈরী করেছিলেন। চন্দ্রশেখর সেটির একটি প্রতিলিপি রোজেনফেল্ডের কাছে পাঠালেন মুলত বোরের মতামতের জন্য। রোজেনফেল্ড জানালেন যে বোর বেশ পরিশ্রান্ত থাকায় কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে যাচ্ছেন, তবে এডিংটনের পাণ্ডুলিপিটি তিনি পলির কাছে মন্তব্যের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর রোজেনফেল্ড নিজের মতামত জানালেন, ''আমি সাহসিকতার সাথে এডিংটনের গবেষণাপত্রটি দু'দুবার পাঠ করেছি; এবং আমি আমার পূর্বের মন্তব্য থেকে একচুলও সরছি না; আমার মতে এটি একটি 'ওয়াইলডেস্ট ননসেন্স' ছাড়া কিছু নয়।'' পলিও অবশ্য এডিংটনের পত্রটিকে বাতিল করে দিয়েছিলেন; বোরকে ব্যক্তিগত ভাবে জানিয়েছিলেন যে

পলি-বর্জন নীতির বিরূদ্ধে এডিংটন জ্যোতির্পদাথবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক যুক্তির অবতারণা করেছেন, কিন্তু তিনি, অর্থাৎ পলি জ্যোতির্পদাথবিদ্যায় মোটেই আগ্রহী নন। আরও সব বিখ্যাত পদার্থবিদদের সাথে আলোচনার ফলে চন্দ্রশেখর সুনিশ্চিত হলেন যে তিনি সঠিক, এবং সব পদার্থবিদই তাঁর সাথে একমত। অনুপ্রাণিত চন্দ্র পুনরায় মিলনারের কাছে আবেদন জানালে মিলনার প্রত্যুত্তরে লিখলেন, 'If the consequences of quantum mechanics contradics the obviously much more immediate considerations, then something must be very wrong with the principles underlying the equation of state derivation.' ১৯৩৫ সালে যখন কোয়ন্টাম বলবিদ্যা বিজ্ঞানের জগতে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই, এবং শুধু পদার্থবিদ্যায় নয় রসায়ন শাস্ত্রেও স্থান করে নিয়েছে, তখন মিলনারের মত জ্যোতিপদার্থবিদ কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মুল নীতি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন ! ভাবতেও অবাক লাগে।

এডিংটনও বসে ছিলেন না, ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে বিখ্যাত হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতায় তিনি তাঁর মত তুলে ধরার পাশাপাশি সুব্রাহ্মনিয়াম চন্দ্রশখরের গবেষণার ফলাফলেরও সমালোচনা করলেন। চন্দ্রশেখর সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীদের তৎকালীন গবেষণার ফলাফল থেকে আলামত পাওয়া যাচ্ছিল যে, নক্ষত্রগুলো একটা সময় মধ্যাকর্ষণের প্রবল চাপে চুপসে গিয়ে একটি বিন্দুতে পরিণত হবে। নক্ষত্রের এই পরিণতির কথা এডিংটন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না, তিনি সব সময় মনে করতেন নিশ্চয় এমন এক প্রাকৃতিক নিয়ম রয়েছে যা নক্ষত্রকে বাঁচাবে। তাই যখন ঘন শ্বেতবামন নক্ষত্রের জীবন বাঁচাতে ফাওলার এগিয়ে এলেন, এডিংটন হয়েছিলেন মহাখুশী। কিন্তু চন্দ্রশেখরের নতুন তত্ত্ব আবার তাঁকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, কারণ তাহলে ১.৪ সূর্য-ভরের বেশী তারকাদের জন্য অপেক্ষা করছে ধ্বংস-বিন্দু। তাঁর এই উদ্বেগই ছিল হার্ভার্ড বর্ক্তৃতার মুল নির্যাস:

> Fowler showed that the newly discovered Fermi-Dirac statistics saved the star from the unfortunate fate which I had feared.
>
> Not content with letting alone, physicists began to improve Fowler's formula. They pointed out that in white dwarf conditions the electrons would have speed approaching velocity of light, and there would be certain relativity effects which Fowler had neglected. Consequently, Fowler's formula called the ordinary degeneracy formula, came to be superseded by a newer formula, called the relativistic degeneracy formula. All seemed well until certain researches by Chandrasekhar brought out the fact that relativistic formula put the stars back in precisely the same difficulty from which Fowler rescued them. The small stars could cool down all right, and end their days as dark stars in a reasonable way. But above a certain critical mass (two or three times that of the sun) the star could never cool down but must go on radiating and contracting until heaven knows what becomes of it. That did not worry Chandrasekhar, he seemed to like stars to behave that way, and believes that is what really happens.

তিনি চন্দ্রশেখরের কর্তৃক অঙ্কিত এই চিত্রকে অভিহিত করেছেন ‘নাক্ষত্রিক ভাঁড়ামি’ (Steller buffoonery) নামে। এর পর পরই চন্দ্রশেখর যুক্তরাষ্ট্রে পারি জমান, এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন তত্ত্বীয় জ্যোতির্পদার্থবিদ্যায় সহকারী অধ্যাপক হিসেবে। সেখান থেকেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি Introduction to the Study of Steller Structure শিরনামে প্রকাশ করেন (১৯৩৭) যা দ্রুত চন্দ্রশেখরকে জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার জগতে খ্যাতিমান করে তোলে। ১৯৪৪ সালে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে তিনি বিলেতের রাজকীয় সমিতির সদস্য (Fellow of the Royal Society: FRS) নির্বাচিত হন। কিন্তু বিজ্ঞান জগতের সর্বোচ্চ সম্মান নোবেল পুরস্কার পেতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল দীর্ঘ দিন - প্রায় পঞ্চাশ বছর; অবশেষে ১৯৮৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির জ্যোতিপদার্থবিদ উলিয়াম আলফ্রেড ফাওলারের সাথে তাঁকে যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কারে ভুষিত করা হয়।

শেষ জীবনের এসে স্বীকৃতি এবং খ্যাতি মিললেও এর আগে চার দশক ধরে চন্দ্রের অবদান অস্বীকৃতই থেকে যায়, এবং এর জন্য মূলতঃ দায়ী ছিলেন এডিংটন। আর্থার আই মিলার তার ‘এম্পায়ার অব দ্য স্টারস’ গ্রন্থে বলেন,

> ‘যতই আমি চন্দ্রের গল্প পড়ছি, ততই আমার কাছে তা অসহনীয় হয়ে উঠছে। মেধার কোন কমতি না থাকা সত্ত্বেও তার জীবন ছিল এক বিয়োগান্তক নাটক। এডিংটন চন্দ্রশেখরের চিন্তাধারাকে অস্বীকার করে প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করার পর চন্দ্র কখনই আর আত্মবিশ্বাস ফিরে পাননি। যদিও পেশাগত সাফল্য তিনি ভালই পেয়েছিলেন, তবুও কোন ধরণের পুরস্কারই তাকে স্বীকৃতি দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল না। যদি তার প্রথম জীবনকে এমনি ভাবে খোঁড়া করে না দেওয়া হত, আমি নিঃসন্দেহ যে তিনি হয়ত আরো বড় কোন আবিস্কার করতে পারতেন।’

চন্দ্রশেখর-এডিংটন বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বের এত কিছু পরও কিন্তু দুজনের মধ্যে শত্রুতার জন্ম নেয় নি, বিতর্ক ছিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে- ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিন্তু তিক্ত হয় নি, অন্ততঃ চন্দ্রের দিক থেকে তো বটেই। এমনকি চন্দ্রশেখরের যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ার পরও দুজনের মধ্যে চিঠি আদান প্রদান অব্যাহত ছিল। ১৯৪৪ সালে এডিংটনের মৃত্যুতে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত স্মারক বর্ক্তৃতায় চন্দ্রশেখর গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছিলেন:

> তিনি ছিলেন উন্নত এবং শুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী এক মানুষ। আমি, উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বাস করিনা যে তিনি কারো সাথে রূঢ় আচরণ করার কথা চিন্তাও করতেন। এবং সেজন্যই তার সাথে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে দ্বিমত করা এত সহজ ছিল। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, তিনি এর উপর ভিত্তি করে কারো ওপর ভুল ধারণা পোষণ করে বসে থাকতেন না। এই ব্যাপারটি অন্যদের ক্ষেত্রে এভাবে প্রযোজ্য নয়।

এখানেই শেষ নয়, ১৯৮২ সালে এডিংটনের জন্মশত বার্ষিকীতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সুব্রাহ্মনিয়াম চন্দ্রশখরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন একটি বর্ক্তৃতামালা প্রদানের জন্য। চন্দ্রশেখর এডিংটনের প্রতি স্মমান জানাতে সেখানেও গিয়েছিলেন, আর বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁর বর্ক্তৃতামালার শিরোনাম ছিল: Eddington: The Most Distinguished Astrophysicist of his time। চন্দ্রশেখর ৮৪ বছর বয়সে ১৯৯৪ সালে ২১শে

আগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার ইমারিটাস প্রফেসর নোবেল বিজয়ী হ্যানস বিথে (সদ্য প্রয়াত) বলেছিলেন, "আমাদের কালের সবচেয়ে বড় জ্যোতির্পদার্থবিদদের মধ্যে চন্দ্র ছিলেন অন্যতম। তিনি দেখিয়েছিলেন যে শ্বেত বামন তারকারা একটি বিশেষ ভরের চাইতে বড় হতে পারে না, এবং বেশি হলে ঐ ভর সুপারনোভা বিস্ফোরণের সুচনা করে দেয়- যা কিনা আকাশের এক অতি চমৎকার দৃশ্য।"

অভিজিৎ রায়, ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com । লেখাটির কিছু অংশ প্রবন্ধকার রচিত 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' গ্রন্থটি (অঙ্কুর প্রকাশনী, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ, ২০০৫) থেকে নেওয়া হয়েছে।